দেশে চলছে দুর্বৃত্তায়নের অর্থনীতি: কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক– ব্যাপক জনগোষ্ঠি নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর[১]

ড. আবুল বারকাত

প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র দিয়ে আর হবে না

দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবন পরিচালনে দুর্গতি কেন বাড়ে? আর কেনই বা ক্রমবর্ধমান এ অসহায়ত্ব রোধ করা যাচ্ছে না? অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকিয় জ্ঞান বিষয়টি বিশ্লেষণে অপারগ। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ-সমীকরণে দুর্বৃত্তায়নের সব নির্দেশক যুক্ত করা প্রয়োজন। যার মধ্যে আছে কালো টাকা, লুটপাট, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অস্ত্র, পেশীশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, অর্থ ও সম্পদ পাচার, কুশাসন, নিপীড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার, নির্বাচনে বিনিয়োগ-সব কিছু। আসলে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতির প্রথাগত পাঠ্যপুস্তকিয় চাহিদা-সরবরাহের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অনেক চলকই কাজ করে। অনেকক্ষেত্রেই নির্ধারক চলক হিসাবেই কাজ করে। যেমন ধরুন, প্রতি কিলোগ্রাম পেঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষক (উৎপাদক) ২ টাকা পান, আমরা কিনি ৩২ টাকায়, অথচ বাজার অর্থনীতির সব হিসেব ঠিক মত চললে আমাদের কেনার কথা প্রতি কেজি ৭-৮ টাকা। আর উৎপাদক কৃষকও পেতে পারেন এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ। কেজি প্রতি মাঝখানের ২২-২৩ টাকার চাঁদাবাজি—সম্ভবত পরিকল্পিত সিন্ডিকেট ভিত্তিক সন্ত্রাস—প্রথাগত অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিশ্লেষণ করবে? ভ্যালু-চেইনে কৃষক আর ভোক্তার এ দূর্দশা কি ভাবে বিশ্লেষণ করবো? চাহিদা-সরবরাহ বিশ্লেষণের সমীকরণে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, কুশাসন (রাজনৈতিক অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট) চলক উহ্য রেখে কোনো দিনই উদঘাটিত হবে না প্রকৃত সত্য। বিষয়টি সম্ভবত প্রথাগত অর্থনীতি শাস্ত্রের ভ্যালু-এডিশন (মূল্য-সংয়োজন) নয়, বিষয়টি মূল্য বৃদ্ধির বা দাম বৃদ্ধির (price), যার সাথে দুবৃর্ত্তায়িত রাজনীতির চাহিদা সরাসরি জড়িত। প্রসঙ্গত বর্তমান নীতি-নির্ধারক রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে অতীব প্রয়োজনীয় একটি পরামর্শ বিনে পয়সায় দেয়া যেতে পারে, সেটা হল: এ দেশে চাল-লবণ-পেঁয়াজ-ই ক্ষমতায় থাকা না থাকা নির্ধারণ করে থাকে।

প্রথাসিদ্ধ অর্থনীতির সীমাবদ্ধতার আরো উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন ধরুণ, বাংলাদেশে পোষাক শিল্পে প্রস্তুত যে জামাটি আমেরিকা-ইউরোপের বাজারে ১,৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ঐ একটি জামার জন্য আমাদের একজন বাংলাদেশী শ্রমিক-বোন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পাচ্ছেন মাত্র ১৫ টাকা (১২০ গুণ পার্থক্য)। ভ্যালু-চেইনের এ দূর্গতি প্রথাগত অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিশ্লেষণ করবে? অথবা ধরুন আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি অথচ দেশের অর্ধেক মানুষ অভূক্ত। অবশ্য তথাকথিত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা একটি রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি: খাদ্য বলতে শুধু চাল-গম অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) বোঝানো হয় যা মানুষকে মোটা ও অলস বানায়, মাছ-মাংস অর্থাৎ প্রোটিন বোঝায় না যা প্রকৃত অর্থে ক্রমবর্ধমান পুষ্টিহীনতা হ্রাস করবে, অর্থাৎ খাদ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবে; সেইসাথে এ মুহূর্তে বাংলাদেশে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপাদন হয় তাকে কিলোক্যালরিতে (শক্তি) রূপান্তর করে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে তো ভাগফল হবে মাথাপিছু দৈনিক ৩০০০ কিলো ক্যালরির বেশি অথচ এ হিসেবে ৪৪% মানুষ এখনও দরিদ্র কেন? (অর্থাৎ যারা মাথাপিছু দৈনিক ২১২২ কিলোক্যালরির কম ভোগ করেন)। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও তো অভূক্ত মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বিষয়টি কি শুধুই উৎপাদনের? শুধুই কি বণ্টনের? না'কি আরো কিছু—সিস্টেমিক? মনে রাখতে হবে অবাধ বাজার অর্থনীতি দরিদ্র-বান্ধব নয়; অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বাজার-বিকৃত হতে বাধ্য। যে বিকৃতি রোধে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য অনস্বীকার্য। কিন্তু চলমান রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। সেইসাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য

---

[১] এ লেখার মূল বক্তব্য ২৩ অক্টোবর ২০০৩-এ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির রাজশাহী আঞ্চলিক সেমিনারে ড. আবুল বারকাত সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বক্তৃতায় উপস্থাপন করেন; পরে পরিমার্জিত আকারে দৈনিক প্রথম আলোর ২৮ শে অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বিকৃতি (যেটা সরকারই করেন) এতই গভীর যে এমন কি প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রও তার জ্ঞান প্রয়োগে ব্যর্থ হয়। সম্ভবত: অর্থনীতি শাস্ত্রকে রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে রেখে এ বিশ্লেষণ হবে অসম্ভব ও অসম্পূর্ণ। আর স্বাধীনতা চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কোনো অর্থনীতিবিদকে কেউ যদি বলেন তিনি রাজনীতি করেন সে ক্ষেত্রে আমি কিন্তু অভিযোগটা ধ্রুব সত্য হিসেবে মেনে নেবো। এ অভিযোগ আসলে কিন্তু কম্প্লিমেন্ট। কারণ দরিদ্র এ দেশে অর্থনীতি শাস্ত্র যদি মানুষের-বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ অভূক্ত, অর্ধভূক্ত, অপুষ্ট, বঞ্চিত, দুর্দশাগ্রস্থ, নিপিড়ীত, লাঞ্চিত, নি:সঙ্গ বিপন্ন মানুষের কথা না বলে তাহলে ঐ শাস্ত্র কার উন্নয়নের, কিসের উন্নয়নের কথা বলে? সেই সাথে অর্থনীতিবিদরা যদি এ সবের কারণ হিসেবে অস্বাধীনতার (unfreedom) কারণগুলো উদঘাটন না করেন তা হলে সে কাজটি কে করবে?

মানবকল্যানমুখী অর্থনীতি চিন্তা কেমন হবে?

কিছুকাল আগে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবৃক্ততায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর জোসেফ স্টিগলিজ আমাদের উদ্দেশ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কিছু কথা বলে গেলেন, "এ দেশে দরিদ্রদের স্বার্থ নিয়ে লাগাতারভাবে বলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা খুবই কম। আপনারা মানব দারিদ্র ও মানব বঞ্চনার বিরুদ্ধে নির্মোহ সত্য কথা বলতে থাকুন,--- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি কৌশল পরিবর্তনে সোচ্চার হোন। ... মনে রাখবেন বাজার অন্ধত্ব পরিহার না করলে খুব বেশি এগুনো যাবে না।" আর আমাদের কাছের মানুষ, নোবেল বিজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেন বললেন, "প্রকৃত উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করতে হলে মানুষের চয়নের স্বাধীনতা প্রশস্ত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে মানুষ যা হতে চায় তাই যেন সে হতে পারে; মানুষ যা করতে সক্ষম সেটাই যেন সে করতে পারে।--- মানুষের সৃজন ক্ষমতা অসীম"। সুতরাং দেশের সত্যিকার উন্নতি বিধানে নিশ্চিত করতে হবে মানুষের পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা, যার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা। যে দেশে এসবের কোনোটিই নিম্ন মাত্রায় অর্জিত হয়নি, যে দেশের বিকাশে এসব স্বাধীনতার অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির প্রবণতাটিই মূখ্য সে দেশের একজন সমাজ সচেতন অর্থনীতিবিদের দায়িত্ব কর্তব্য কি ধরণের হওয়া উচিত? নি:সন্দেহে তা হতে হবে মানবকল্যানমূখী যার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও মানবিক দারিদ্র স্থায়ীভাবে দূর হতে পারে। তাও হতে হবে অতি দ্রুত। মানবকল্যাণমুখী সৃজনশীল এ কর্মকাণ্ড অবশ্যই সম্ভব— সামনের ১০-১৫ বছরের মধ্যেই।

অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করেছে

দেশের চলমান অর্থনীতি আর সংশ্লিষ্ট নীতি-রাজনীতি নিয়ে অনেকেই আজ সত্যিই দুশ্চিন্তিত। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আর এ উদ্বেগের ভিত্তি ইতোমধ্যে যথেষ্ট শক্তিমান যা ক্রমবর্ধমান হারে পুনরুৎপাদিত হচ্ছেঃ গত তিন দশকের অধিককালে সরকারি ভাবে যে ২০০,০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ অনুদান এসেছে তার ৭৫% আত্মসাৎ (লুট) হয়েছে–দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্তিতে (inclusion of the excluded) কাজে লাগেনি; বছরে এখন ৭০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হচ্ছে (যা জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ); মানি-লন্ডারিং হচ্ছে বছরে ৩৪,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ; ৩০,০০০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ-অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে; গুটি কয়েক ক্ষমতাধর বছরে ৮,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ঘুষ খাচ্ছেন; আর ক্রমবর্ধমান ধন বৈষম্যের কথা তো সরকারিভাবেই স্বীকৃত— মাত্র ৫% ধনী পরিবার দেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৩০% দখল করে আছে (আসলে কালো টাকা যোগ করলে ৫% ধনীর দখলে হবে ৫০% আয়)। আর এসবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশে ব্যপক জনগোষ্ঠির সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের শর্তাদি বিনষ্ট করছে; মানুষের মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে কাজ করছে; দালাল পুঁজির বিকাশ ত্বরান্বিত করছে, যে পুঁজি উৎপাদনশীল খাতে নয় অনুৎপাদনশীল খাতের বিকাশে অতি উৎসাহী; সরকারি-বেসরকারি খাতে জাতীয় সম্পদের বিপুল অপচয়ের কারণ হিসেবে কাজ

করছে; প্রকৃত মানব উন্নয়ন অনিশ্চিত করছে; নগরায়নের নামে বস্তিয়ায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে; গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিঃস্বায়িত করে গ্রামে এখন ভিক্ষুকায়ণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। এক কথায় সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে শেষাবধি সমগ্র উপরিকাঠামোকেই (রাষ্ট্রের মতাদর্শসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান) জনকল্যাণবিমুখ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে, যার অন্তর্ভুক্ত আইন শৃংখলা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন, সংসদ, স্থানীয় সরকার, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রীয়-অরাষ্ট্রীয় ছোট-বড় ক্রয়-বিক্রয়।

অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনৈতিক দুর্বত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করেছে। দুর্বৃত্তায়িত এখন সমগ্র বাংলাদেশ। ১৪ কোটি মানুষের এ দেশে দুর্বৃত্তায়নের পরিণাম দাঁড়িয়েছে এমন যে খাদ্যগ্রহণের নিরিখে এখন ৭ কোটি মানুষ দরিদ্র আর মৌলিক চাহিদার মূল্যমানের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি; মোট ৪ কোটি যুবকের ২ কোটি বেকার (আমার ধারণা এ দেশে বছরে ১৬ কোটি বোতল ফেনসিডিল আসছে, আর সেই সাথে আছে ১৫-১৬ লাখ অবৈধ অস্ত্র); প্রতিবছর শ্রম বাজারে যে ৩০ লাখ মানুষ সংযোজিত হয় তার মাত্র ৮ লাখ মানুষ কাজ পায়; ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, কাজের অভাব আর দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষের স্বত্বাধিকার বঞ্চনা চিরস্থায়ী করছে; ৯ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সুযোগ বঞ্চিত; ৮ কোটি মানুষ কার্যত নিরক্ষর; স্যানিটেশন সুবিধে নেই ১০ কোটি মানুষের; ১১ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত; বছরে ১৬ লাখ শিশু ৫ বছর বয়স পেরুনোর আগে মৃত্যুবরণ করছে, যে মৃত্যুর ৫০% দারিদ্র উদ্ভুত রোগ বালাই, যা সহজেই প্রতিরোধযোগ্য। অথচ যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে গড়ে ২-৩ বছরে আমরা যে পরিমাণ ব্যয় করি সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে কিন্তু এ দেশ থেকে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগ চিরতরে নির্মূল সম্ভব।

গত তিন দশকের দুর্বৃত্তায়নের খেরো খাতা কি বলে?

তাহলে গত তিন দশকের উন্নয়ন ইতিহাসে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতি ও সমাজের সকল স্তরে দুর্বৃত্তায়ন ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত-বিপন্ন মানুষদের নিরন্তরভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখার একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছি। এটি এমন এক পরিবেশ যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের আরো বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ এমন পরিস্থিতি যা মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়াগুলো নস্যাৎ করে দেয়। বিপন্নদের করে বিপন্নতর। গত তিন দশকের হিসেবের খেরো খাতা প্রমাণ করছে যে, এখন এক সর্বগ্রাসি লুন্ঠন সংস্কৃতি আমাদের পেয়ে বসেছে। যা কিছু মানব উন্নয়নের বিরুদ্ধে যায়, যা কিছু দুর্বৃত্তায়নে সহায়ক, সার্বিক পরিস্থিতি যেন সেগুলোর প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করছে। তিন দশকের খেরো খাতা একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা তুলে ধরেছে: মানব উন্নয়নের জন্য অনুকূল সকল সূচক ক্রমশ নিচের দিকে নামছে এবং দুর্বৃত্তায়নের প্রতি অনুকূল সূচকগুলো আরো শক্তিশালী হচ্ছে। গত তিন দশকের হিসেবের খেরো খাতা যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও উন্নয়ন বিরোধী সেগুলো শনৈঃ শনৈঃ প্রবৃদ্ধি লাভ করছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারী পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি।

গত তিন দশকে কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠি নিঃস্ব হয়েছেন; সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি; সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সাথে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো টাকার দাপট,কমেছে জনগণের প্রতি ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ।এ সব কিছুর ফলে মানুষের মুক্ত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগসমূহ ক্রমাগত সীমিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গত তিন দশকের উন্নয়নে আমরা আবার সেই বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতিতে আরো জোরালোভাবে ফিরে গেছি: একটি অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী মাত্র ১০ লাখ মানুষ– ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন এরা চালকের আসনে থাকে;

অপর অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ– এরা বহিস্থ, বঞ্চিত, বিপন্ন, নিঃস্ব, ছিটকে-পড়া মানুষ।

তা হলে তো অর্থনীতি শাস্ত্রের উত্তরণ জরুরি

এ সবই ঘটেছে তখন যখন আমাদের সংবিধান বলছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যাস্ত থাকিবে" (অনুচ্ছেদ ৭)। অবস্থা যে মাত্রায় খারাপ তাতে তো বলতে হয় দুর্বৃত্তায়ন- সৃষ্ট বঞ্চনার ফাঁদ ছিন্ন না করে সমস্যার সমাধান হবে না। দুর্বৃত্ত ও দারিদ্র লালন- উভয়ই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। সমস্যার সমাধানে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক আদর্শ ভিত্তিক নেতৃত্ব ও জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। অর্থনীতবিদ হিসেবে আমরা সম্ভবতঃ সংবিধানের বিধান মোতাবেক জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চাহিদা (যা পূরণে সংবিধান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে) আর প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র যা সরবরাহ করছে- এ দু'য়ের ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান ফারাক নিরুপণ করতে পারি; ফারাকের কারণসমূহ উদঘাটন করতে পারি; ফারাক হ্রাসে যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবনা পেশ করতে পারি। সেক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থশাস্ত্রকে বৃহৎ গণ্ডির রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রের অনুগত শাস্ত্র হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে হবে। একজন অর্থনীতিবিদ তো মানবকল্যাণবিরোধী বা মানবকল্যাণবিমূখ হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের বাইরে আসতে হবে। সময় ও সমাজ তো সেটাই দাবি করে।